ক্রান্তিকালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠী: একটি পর্যালোচনা

রেহনুমা আহমেদ*

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর লিখিত নৃবৈজ্ঞানিক সাহিত্য পর্যালোচনার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। তবে এই পর্যালোচনাটি পূর্ণাঙ্গ নয়, আংশিক ও নির্বাচিত (selective);[১] পঞ্চাশ দশকের কিছু এথনোগ্রাফীক (ethnographic) কাজ এবং চলতি দশকের কিছু প্রকাশনার উপর এই প্রবন্ধে আলোকপাত করা হবে। এই ত্রিশ বছর সময়ে এক দিকে পার্বত্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবনে যেমন পরিবর্তন এসেছে তেমনি অন্যদিকে নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডের বিষয়বস্তুরও বদল ঘটেছে।

সূচনা: পঞ্চাশ এবং ষাট দশক

ডেনিস (একজন ভাষাতাত্ত্বিক) এবং লুসিয়ান (একজন নৃবিজ্ঞানী) বার্নো ১৯৫১-৫২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে বারো মাসব্যাপী একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। এখানে আমি যে দুটো প্রবন্ধের পর্যালোচনা উপস্থাপন করবো তার একটি ডেনিস এবং লুসিয়ান বার্নোর যৌথ রচনা "Chittagong Hill Tribes" (১৯৫৭),[২] এবং অপরটি লুসিয়ান বার্নোর প্রবন্ধ "Ethnic Groups of Chittagong Hill Tracts" (১৯৬০)[৩]। পঞ্চাশ দশকের স্ট্যান্ডার্ড বর্ণনামূলক এথনোগ্রাফীর মানদন্ডে তাদের কাজ প্রতিনিধিত্বমূলক। এখানে অবশ্য "স্ট্যান্ডার্ড বর্ণনামূলক এথনোগ্রাফী" বলতে কি বোঝায় সে প্রশ্নটি এসে যায়। আর তা জানতে হলে অবশ্যই নৃবিজ্ঞান বিষয়ের গোড়াতে (origin) সমালোচনামূলক

* নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।

শব্দের বুৎপত্তিগত দিক থেকে নৃবিজ্ঞান (anthropology) অর্থ হচ্ছে মানব বিষয়ক জ্ঞানকান্ড। ক্লদ লেভি স্ট্রস এর-ভাষায় "মানুষের বৈশ্বিক জ্ঞান নৃবিজ্ঞানের লক্ষ্য—পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক এবং ভৌগলিক বিস্তৃতি এর অন্তর্ভুক্ত; এবং নৃবিজ্ঞান সেই জ্ঞান অনুসন্ধানে ব্যাপৃত যা হোমিনিডে থেকে আজকের জাতিসমূহ পর্যন্ত মানুষের বিবর্তনের সামগ্রিক ধরনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এবং কি বিশালাকার আধুনিক শহর, কি ক্ষুদ্রতম মেলানিশিয়ান উপজাতি—সকল মানব সমাজের জন্যই ন্যায্য, এমন ইতিবাচক বা নেতিবাচক নির্বিশেষে উপসংহারে পেঁছুতে চেষ্টা করে নৃবিজ্ঞান" ("... anthropology aims at a global knowledge of man—embracing the subject in its full historical and geographical extension, seeking knowledge applicable to the whole of human evolution from, let us say, Hominidae to the races of today, and leading to conclusions which may be either positive or negative but which are valid for all human societies, from the large modern city to the smallest Melanesian tribe")[৪]। তবে আজকাল সাধারণভাবে এ কথা স্বীকার হয় যে, কার্যতঃ 'আদিম'/অপাশ্চাত্য মানুষ ছিলো নৃবিজ্ঞানের গবেষণার লক্ষ্য আর এই নিরীক্ষার লক্ষ্যবস্তু ক্ষুদ্র, প্রাক-শিক্ষিত এবং প্রাক-শিল্পায়িত সমাজ; এবং এ সকল সমাজের অধিবাসীগণ বিবিধভাবে নির্দেশিত হয়েছেন 'আদিম' (টায়লর, বোয়াস, লোঈ, মীড, র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন, হোয়েবেল), 'বণ্য'/'অসভ্য' (ম্যালিনোস্কি) হিসেবে। গোড়াতে নৃতাত্ত্বিক উপাত্ত সংগৃহীত হতো পরিব্রাজক, মিশনারী, ঔপনিবেশিক এজেন্ট, ঔপনিবেশিক প্রশাসকের লেখনী থেকে। তবে পরবর্তীতে যখন ধীরে ধীরে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয় যে নৃবিজ্ঞানী নিজে সরাসরি সরেজমিনে যেয়ে, থেকে গবেষণা করতে পারে (ম্যালিনোস্কি, বোয়াস) তখন থেকেই এথনোগ্রাফী এবং মাঠ গবেষণা (fieldwork) একই সাথে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ও একে অপরকে শক্তিশালী করে তুলেছে। "সুতরাং এথনোগ্রাফীক গবেষণা হচ্ছে সেই গবেষণা যেখানে সাধারণতঃ ক্ষুদ্র মাত্রার সমাজের একটি সামাজিক ইউনিটের কেস

স্টাডি তুলে ধরা হয়"। ("... ethnographic research thus came to consist of a case study of one social unit, usually a small-scale society...") এবং যেখানে এথনোগ্রাফারের দায়িত্ব হচ্ছে "...যে সংস্কৃতির উপর সমীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে তার উপর প্রাথমিক, বিস্তারিত ও সুসংহত তথ্য সংগ্রহ করা" ("... detailed, first hand systematically collected facts about the culture being studied")[৫]। আর এ ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনা করা হয় সামাজিক সংগঠন, আত্মীয়তা, বিবাহ প্রথা, বিশ্বাস ব্যবস্থা, রিচুয়াল, লোক শিল্প, পুরাণ, প্রতীকবাদ (symbolism), লোককাহিনী, লোক চিকিৎসা প্রথা, যাদুমন্ত্র, নিষেধ (taboo) ইত্যাদির উপর। অবশ্য এখানে নৃবিজ্ঞানীর নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে গবেষণাধীন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সম্পর্কের অপরিহার্য উপাদানটি সযত্নে পরিহার করা হয়। অন-ঐতিহাসিক (ahistorical) অভিজ্ঞতামূলক (empirical) দৃষ্টিভঙ্গি 'নেটিভ' এবং তাদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে কাঁচের বাক্সের মধ্যে প্রদর্শিত প্রজাপতির ন্যায় সময়হীন (timeless), চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় করে তোলে[৬]। ফলতঃ ঔপনিবেশিক কর্তৃক 'নেটিভ' ব্যবস্থার ধ্বংস ও মূলোৎপাটন দৃশ্যপট থেকে হারিয়ে যায় তবে একটি paranoia এই উপলব্ধির ভিত্তিতে কাজ করতে থাকে যে, ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণবাদ এ সকল ভিন্ন সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে, তাই শারিরীক ও সাংস্কৃতিক অর্থে বিলুপ্ত হবার আগে তাদের লিপিবদ্ধ করতে হবে।[৭]

যা হোক বার্নো এবং বার্নো-এ ফিরে আসা যাক। প্রথম প্রবন্ধটি মানুষ, চাষাবাদ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং গ্রামীণ জীবন— এই চারটি অংশে বিভক্ত। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের আখ্যায়িত করা হয়েছে "উপজাতীয় মানুষ" (tribal people) এবং "পাহাড়ী মানুষ" হিসেবে। পক্ষান্তরে বাকি দেশের বাসিন্দাদের চিহ্নিত করা হয়েছে "বাঙ্গালী" ও "সমতল ভূমির মানুষ" (plains people) শব্দ দ্বারা। আগেই আমি উল্লেখ করেছি যে, ৬০ দশকের স্ট্যান্ডার্ড এথনোগ্রাফীর নিদর্শন হচ্ছে আলোচ্য প্রবন্ধটি। পনের পাতার এ প্রবন্ধে আলোচিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন বিষয়াদি আমি সংক্ষেপে তুলে ধরেছি এবং এতে আমার উপরোক্ত মন্তব্যটি আশা করি স্পষ্ট হবে। প্রবন্ধে ভৌগলিক অবস্থান, যাতায়াত ব্যবস্থা, বাণিজ্যিক দ্রব্য, প্রশাসন,

বিভিন্ন গোষ্ঠী, তাদের ভাষা, ধর্ম, উৎস (origins), ঐতিহ্যবাহী জুম চাষ (চাষাবাদের মুখ্য পদ্ধতি), স্বল্প বিস্তৃত সমতল ভূমির চাষাবাদ (অর্থাৎ ওয়েট-রাইস চাষাবাদ), সম্পত্তির ধারণা, কর্ণফুলিতে হাইড্রো ইলেক্ট্রিক শক্তি কেন্দ্র নির্মাণ, শিল্প নৈপুন্যতা, নারী-পুরুষের শ্রম বিভাজন, "উপজাতীয়" পোষাক, চুলের স্টাইল, বিবাহ উৎসব ও নিয়মাবলী, "উপজাতীয়" এবং গ্রামীণ সংগঠন, বাঙ্গালীদের সাথে যোগাযোগ হিসেবে বৃহদাকার "উপজাতীয়" সমূহের (চাকমা, মারমা) ভূমিকা, বিদ্যালয়, গৃহায়ন, আনন্দ উৎসব ও বহিঃ বিশ্বের (লেখকদের ভাষায় ('উপজাতীয়-দের')... চলতি ঘটনা এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল সম্পর্কে জ্ঞান খুবই সীমিত") সাথে "উপজাতি" সমূহের বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে।[৮]

"Ethnic Groups of Chittagong Hill Tracts" শিরোনামের প্রবন্ধটি মূলতঃ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপর প্রকাশিত গ্রন্থ এবং প্রতিবেদনের তালিকা বিশেষ। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর উপর তারা যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেগুলো হচ্ছে ক) নাম, খ) আনুমানিক সংখ্যা, গ) আবাসস্থান, ঘ) ভাষা (একক/শাখা/বিভাগ) ঙ) উৎস। অপর পাতায় উপস্থাপিত চিত্রে তাঁদের সংগৃহীত তথ্যের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। একই এথনোগ্রাফীক গবেষণার উপর ভিত্তি করে একই মনোভঙ্গিতে প্রবন্ধ দুটো লেখা হয়েছে। তবে সবচাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, প্রথম প্রবন্ধে যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের দেখানো হয়েছে "উপজাতীয়" মানুষ (tribal people) এবং পাহাড়ী "উপজাতীয়" (hill tribal) হিসেবে সেখানে দ্বিতীয় প্রবন্ধে, তাদের অভিহিত করা হয়েছে "জনগোষ্ঠী" অথবা "মানুষ" হিসেবে (উদাহরণ-স্বরূপ, খ্যাং মানুষ ইত্যাদি)। বার্নো এবং বার্নো আলোচনা প্রসঙ্গে শুধু একটি বাক্যে ভাষাগত পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার বিশদ ব্যাখ্যা দেন নি। তাঁদের ভাষায়, "এই সকল গোষ্ঠীর মধ্যে একীভূত হবার প্রবণতা বিদ্যমান থাকায় তাদেরকে যথাযথ ভাবে উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না বরং এথনো-লিঙ্গুইষ্টিক (ethno-linguistic) গোষ্ঠী হিসেবেই কেবল অভিহিত করা চলে। যদি ও তাদের সুনির্দিষ্ট স্বীকৃত গোত্র (clan) রয়েছে তথাপি তারা কোন আনুষ্ঠানিক উপজাতীয়

সংগঠনের পরিচয় তুলে ধরেনা। পক্ষান্তরে, উপজাতি হিসেবে অভিহিত হবার জন্যে চাকমা এবং মারমাদের যেমন রয়েছে সংখ্যাগত আধিক্য তেমন রয়েছে, সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের পর্যাপ্ততা।" ("All of these groups have tended to intermingle, so that they cannot be classified properly as tribes but only as ethno-linguistic groups. They do not display any formal tribal organisation, although there are definitely recognised clans. On the other hand, the Marma and Chakma are numerous enough and sufficiently organised to warrant being called tribes.")[৯] বস্তুতঃ "উপজাতি" নৃবিজ্ঞানের একটি অন্যতম অস্পষ্ট ধারণা; সে কারণেই আমি সাম্প্রতিক গবেষণার আলোকে "উপজাতি" ধারণাটির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চাই। যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীগণ বাংলাদেশে সাধারণতঃ "উপজাতীয়" হিসেবে বিবেচিত হন সেহেতু আলোচ্য বিষয়ের সাথে এর বিপুল প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

ইকেন্নো নিজিমিরো, নাইজেরীয় নৃবিজ্ঞানী, "উপজাতি" ধারণাটির সমালোচনা করে বলেন, এটি যত না বিজ্ঞানসম্মত ধারণা তার চাইতে অধিকতর মতাদর্শিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত।[১০] অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারীর "উপজাতি"-র সংজ্ঞায়—"একদল মানুষ যারা একটি সম্প্রদায় গঠন করেছে এবং তারা দাবী করে যে তারা অভিন্ন পূর্ব-পুরুষদের সন্তান সন্তুতি;... একটি মাত্র জাতি, বিশেষতঃ ঐ সকল মানুষ যারা একজন দলপতি বা প্রধানের অধীনে আদিম অথবা বর্বর জীবন যাপন করে..."। ("A group of persons forming a community and claiming descent from a common ancestor...A race of people, now applied especially to people in a primitive or barbarous condition, under a headman or chief")[১১] একজন ঝুঁকে পড়েন একটি সুস্পষ্ট জাতি (race) অথবা সুস্পষ্ট মানব বংশের ধারণার দিকে যা কিনা একটি ভ্রান্ত ধারণা। পুনরায় নিজিমিরোর উদ্ধৃতি দিচ্ছি, "জাতি" শব্দটি একটি মিথ, এবং শব্দটির উদ্ভাবকদের কল্পনার মধ্যেই কেবল এর অস্তিত্ব রয়েছে। বিশুদ্ধ জাতি বলে কিছু নেই... "জাতির" ধারণার বেলায় যা প্রযোজ্য

"উপজাতি" শব্দের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কার্যতঃ জৈবিক ভাবে বিশুদ্ধ কোন উপজাতীয় গোষ্ঠীর অস্তিত্ব নেই। মানব সমাজে অভিগমনকারী গোষ্ঠীর আত্মীকরণ এবং একত্রীকরণ সাধারণ ঘটনা; সুতরাং বিশুদ্ধ সুস্পষ্ট মানব বংশের ধারণা ভ্রান্ত"। ("The word 'race,' I have to repeat, is a myth, and exists in the imagination of its inventors. There is nothing like a pure race... As with 'race' so also with the notion of the word 'tribe', for there is no tribal group that has remained biologically pure. Assimilation and absorption of migrant groups are common in human societies, and the notion of a pure, distinct human stock is false")।[১২] নিজিমিরো লিন্টন কর্তৃক প্রদত্ত "উপজাতির" সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন ধারণাটির অস্পষ্টতা তুলে ধরার জন্য। লিন্টনের ভাষায় "এর সরলতম আকারে উপজাতি হচ্ছে একই দখলকৃত ভূখণ্ডে সন্নিবেশিত একটি দল সমষ্টি, ঘন ঘন বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগের কারণে ও সংস্কৃতির অসংখ্য সাদৃশ্যের কারণে যাদের মধ্যে ঐক্যের মনোভাব বিরাজ করে এবং যাদের সম্প্রদায়গত স্বার্থ রয়েছে। আনুষ্ঠানিক উপজাতীয় সংগঠনের কম-বেশী বিস্তৃত উপরি কাঠামো সমূহ এই মৌলিক শর্তের ভিত্তিতে অনুপ্রাণিত হতে পারে। উপজাতীয় গোষ্ঠীসমূহ এগুলো ছাড়াই তৎপরতা চালাতে পারে এবং অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে।" ("In its simplest form the tribe is a group of bands occupying contiguous territories and having a feeling of unity deriving from numerous similarities in culture, frequent friendly contacts, and a certain community of interests. More or less elaborate superstructures of formal tribal organisation may be erected upon this basic condition, but tribal groups can exist and function without them.")[১৩] নিজিমিরো এই সংজ্ঞার যে সমালোচনা করেছেন তা আমি তুলে ধরছি। তার ভাষায়, "সাদা, কালো, হলুদ নির্বিশেষে সব মানব সম্প্রদায়েই রয়েছে অভিন্ন সামাজিক বৈশিষ্ট্য: ১) অভিন্ন ভূখণ্ড দখল, এবং ২) ঐক্যের চেতনা, যার

উৎস হচ্ছে ৩) সংস্কৃতির সাদৃশ্য এবং ঘন ঘন বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ।" ("All human communities, whether white, black or yellow, exhibit the same social characteristics 1) occupying the same territory, and 2) having a feeling of unity deriving from 3) similarities of culture and frequent friendly contacts")।[১৪] নিজিমিরোর বক্তব্য হচ্ছে যে, নৃবিজ্ঞানীগণ একটিকে বলেছেন উপজাতি এবং অপরটিকে বলেছেন জাতি। অথচ এই দুইয়ের মধ্যেকার পার্থক্যটি খুবই অযৌক্তিক।

ঔপনিবেশিক এবং উপনিবেশ-উত্তর শক্তি কর্তৃক "উপজাতি" এবং "উপজাতীয়তা" পরিভাষার ব্যবহারকে মতাদর্শিক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত বলে স্বীকার করে নিয়ে মরিস গডেলিয়ার একটি প্রবন্ধে নৃবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন পর্যায়ে "উপজাতি" প্রত্যয়ের দ্বারা কি বুঝিয়ে থাকেন এবং কিভাবে এ সংজ্ঞাটি কেবল মাত্র ধারণার কোন সংকট নয় বরং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি জ্ঞানকাণ্ডের সংকট, তা তুলে ধরেছেন। গডেলিয়ারের মতে[১৫] নৃবিজ্ঞানীগণ 'উপজাতি' প্রত্যয়টি যে জন্য ব্যবহার করেন তা হচ্ছে ক) অপরাপর সমাজ (উদাহরণস্বরূপ দল, রাষ্ট্র ইত্যাদি) থেকে "এক প্রকারের সমাজ"-কে আলাদা করার জন্য এবং খ) মানব সমাজে "বিবর্তনের একটি ধারা"-কে চিহ্নিত করার জন্য। অবশ্য বির্বতনবাদী দৃষ্টিকোন থেকে দুটি ব্যবহারই আন্তঃসম্পর্কিত; কেননা "বিবর্তনের প্রতিটি ধাপ সংগঠনের নির্দিষ্ট পদ্ধতির দ্বারা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত" ("...each stage of evolution is characterised by a specific mode of social organisation")।[১৬] বিবর্তনবাদী মর্গান "উপজাতি"-কে একটি পূর্ণাংগ সংগঠিত সমাজ বলে অভিহিত করেছেন; অর্থাৎ এমন সামাজিক সংগঠন যা নিজের পুনরূৎপাদনে সক্ষম। একটি "উপজাতি" হচ্ছে এক গুচ্ছ গোত্রের (clan) সমষ্টি, যার রয়েছে একটি নিজস্ব নাম, একটি স্থানিক ভাষা (dialect), একটি সর্বোচ্চ (supreme) সরকার এবং নিজস্ব দখলাধীন কিছু ভূখন্ড যা তারা রক্ষা করে। আরও রয়েছে একটি অভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস ও cult; রয়েছে গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্বিবাহ।

তাত্বিক আলোচনায় না যেয়ে আমি এখানে শুধু গডেলিয়ার মার্শাল

সাহলিন্সের শ্রেণী বিভাগের সমালোচনা করতে যেয়ে "উপজাতি" প্রত্যয়টির যে তিনটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন সেগুলোর উল্লেখ করব। প্রথমত, "উপজাতীয়" সমাজের সকল প্রাথমিক সামাজিক ইউনিটই বহুপারিবারিক দল (multifamilial group) এবং এই দল যৌথভাবে সম্পদ আহরণ করে এবং সারা বছর ধরে অথবা বছরের অধিকাংশ সময় আবাসিক ইউনিট গঠন করে। দ্বিতীয়ত, আত্মীয়তার সম্পর্কের দ্বারা গঠিত এই সব বহুপারিবারিক দল অথবা প্রাথমিক খণ্ড (primary segment) চরিত্রগত দিক থেকে বহুকার্যগত (multifunctional) অর্থাৎ, একই বংশজাত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আত্মীয়তার সম্পর্ক এক সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক সম্পর্ক, মতাদর্শিক সম্পর্কের সাথে কাজ করে; ইভান্স প্রিচার্ড একে বলেছেন "কার্যগতভাবে সাধারণীকরণ" (functionally generalised)। অন্য কথায় উৎপাদন পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো থেকে আত্মীয়তা পৃথক এবং বিচ্ছিন্ন নয়। তৃতীয়ত: সাহলিন্স মনে করেন (যা কিনা গডেলিয়ারের মতানুসারে স্ববিরোধী) প্রাথমিক খন্ড কার্যগতভাবে একই রকম; এগুলো অর্থনৈতিকভাবে, মতাদর্শগতভাবে, রাজনৈতিকভাবে এবং সাংস্কৃতিক ভাবে অভিন্ন এবং সমান।[১৭]

উপরের আলোচনা থেকে এ কথাটি বেরিয়ে আসছে যে, তত্ত্বগত এবং মতাদর্শগত—উভয় অর্থেই "উপজাতি" প্রত্যয়টি অত্যন্ত জটিল। এই মতাদর্শিক প্রেক্ষিতে আজকাল বহু নৃবিজ্ঞানী "উপজাতি" প্রত্যয়টির বদলে "জনগোষ্ঠী" (ethnic group) শব্দটি ব্যবহার করেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে সোভিয়েত নৃবিজ্ঞানীগণ এথনোস (ethnos) এবং এথনোজেনেসিস (ethnogenesis) শব্দ ব্যবহার করেন। এথনোজেনেসিস শব্দ "...সেই প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার মাধ্যমে জন-বোধ সৃষ্টি হয়।" ("...the process whereby a sense of peoplehood is generated.")[১৮]

এবং বর্তমান : আশির দশক

আমি দুটো সংকলনের উপর আলোকপাত করব। এর একটি জার্মান নৃবিজ্ঞানী উলফগ্যাঙ মে[১৯] কর্তৃক সম্পাদিত এবং অপরটি একটি কন্ফারেন্সে পঠিত প্রবন্ধের সংকলন। প্রথম গ্রন্থের কিছু প্রবন্ধ

পরবর্তীতে সম্মেলন সংকলনে[২০] পুণঃমুদ্রিত হয়েছিল। আমি দুটো গ্রন্থেই প্রকাশিত এমন কতকগুলো প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করব যেগুলোতে পরিবর্তিত পরিস্থিতি তুলে ধরার সাথে সাথে পরিবর্তনের ব্যাখ্যাও উপস্থাপন করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জনগোষ্ঠী হচ্ছে চাকমা। প্রকৃতপক্ষে সপ্তদশ শতাব্দীতে এরা সমুদ্রতীরবর্তী সমতল ভূমিতে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু পরবর্তীতে বাঙ্গালীদের সাথে আন্ত জনগোষ্ঠী দ্বন্দের (inter ethnic conflicts) কারণে তারা ধীরে ধীরে পূর্বদিকের পাহাড়ী অঞ্চলে সরে যায়। সুতরাং এ কথা প্রতীয়মান হয়েছে, যে সকল গোষ্ঠী পাহাড়ী উপত্যকায় বসবাস করছে তারা সম্ভবত অধিকতর সাম্প্রতিক কালের অধিবাসী (চাকমা, মারমা, খাসিয়া)। পক্ষান্তরে, ম্রু, কুমি, লুসাই ইত্যাদি যে সকল গোষ্ঠী পাহাড়ে বসতি স্থাপন করেছে তারা মূলত পুরানো অধিবাসী অর্থাৎ এরা উপত্যকায় বসবাসরতদের আগেই পাহাড়ে বসতি স্থাপন করেছে। এই সকল জনগোষ্ঠী '…মূলত উচ্চমাত্রায় আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়াই স্ব-শাসিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।" ("…basically self governing small entities without highly formalised political systems.")[২১] সমতল ভূমির বাসিন্দাদের সাথে এদের অর্থনৈতিক বিনিময় (কাঠ, সূতা, বাঁশের বিনিময়ে আমদানীকৃত দ্রব্য চাল, মহিষ গ্রহণ) প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল শাষকগণ এই বিনিময় ব্যবস্থার উপর কর ধার্য করে। ধার্য্যকৃত কর প্রদান করা হতো দ্রব্যাদিতে (কার্পাস)। মোগলদের পরে আগত বৃটিশ শাসকগণও এই করব্যবস্থা বজায় রাখেন। তবে তারা কর বাবদ কার্পাস গ্রহণের বদলে প্রবর্তন করেন 'অর্থ' গ্রহণের বিধান (১৭৮৯—এ)। ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম annex করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিলো, বৃটিশ শাসকগণ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, প্রধানত দু'টো কারনে ঃ ক) বৃটিশ সম্প্রসারণবাদের কারণে ঔপনিবেশিক সরকার লুসাই সামরিক অভিযান পরিচালনা করে "উপজাতীয়" দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে এবং খ) পাহাড়ী আবহাওয়ার উপযোগী চা প্লানটেশন (plantation) কর্মসূচী বাস্তবায়ণের লক্ষ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা। ১৮৬০ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বৃটিশ শাসন কার্য্যতঃ

পরিচালিত হয়েছিলো সামরিক উপকরণের সাহায্যে। পরবর্তীতে তারা ধীরে ধীরে এই সামরিক কর্মসূচীর সাথে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীও যুক্ত করেছিলো। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী, জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত বৃটিশ অফিসার জেলা কিংবা জেলার অভ্যন্তরে সব ধরনের অভিগমন (migration) প্রতিরোধ করতে পারতেন। এই ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্য ছিলো, "প্রতিটি উপজাতীয় প্রধানকে কেন্দ্র করে তাদের একটি স্থানে দৃড়ভাবে স্থাপন করা'' ("...to consolidate and localise each tribe round its chief.")।[২২] যাতে করে করবাবদ আয় স্থিতিশীলতা অর্জন করে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পার্বত্য চট্টগ্রামকে "সম্পূর্ণ বহির্ভূত এলাকা" ("totally excluded area") ঘোষণা করে। এতে পার্বত্য ও সমতল ভূমির রাজনৈতিক যোগাযোগের আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদ ঘটে। "উপজাতীয়" নাগরিক ও প্রধানগণ আশা করেছিলেন যে, তারা নিজেরা স্থানীয় রাজতন্ত্র (local princedom) প্রতিষ্ঠা করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি আধা স্বাধীন দেশীয় রাজ্যে (semi independent native state) রূপান্তরিত করবেন এবং বাঙ্গালী হস্তক্ষেপ ও বসতি স্থাপন প্রতিরোধের প্রয়াস পাবে। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রভাব মুক্ত রাখতে চেয়েছিলো বৃটিশরা। ভারত বিভাগের পর ভারতের ভাগে পড়েছিলো পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পাকিস্তান অংশে পড়েছিল পাঞ্জাবের ফিরোজপুর। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস শিখ আন্দোলন এড়াবার উদ্দেশ্যে ভারতকে দিয়ে দেওয়া হয় ফিরোজ-পুর আর পাকিস্তানের ক্ষতি পুষিয়ে দেবার জন্য তাকে দেওয়া হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম।[২৩] ১৯৫৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে "বিশেষ মর্যাদা" প্রদান করা হয় সরাসরি করাচী থেকে এর প্রশাসন পরিচালনার মাধ্যমে। ১৯৫৮ সালে সামরিক বাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পর ক্রমবর্ধমান হারে পার্বত্য চট্টগ্রাম 'উন্মুক্ত' ("opened up") করে দেওয়া হয়।[২৪] সরকারী নিষেধাজ্ঞা সত্বেও বাঙ্গালীরা পাইকারী ও খুরচা ব্যবসা, ঋণ, পরিবহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রায় একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এর ছয় বছর পর ১৯৬৪ সালে, পার্বত্য চট্টগ্রাম তার বিশেষ মর্যাদা হারিয়ে ফেলে।[২৫] ১৯০০ সাল হতে চলে আসা ইমি-গ্রেশনের ওপর প্রতিবন্ধকতা তুলে নেয়া হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের এখনকার জনগোষ্ঠী দ্বন্দের (ethnic conflict) মূল নিহিত রয়েছে বৃটিশ উপনিবেশবাদ এবং পরবর্তী পর্যায়ের উপনিবেশিক সরকারগুলোর মধ্যে। উল্লেখিত গ্রন্থে বিভিন্ন লেখক এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, রাষ্ট্র কর্তৃক শক্তি, খনিজ সম্পদ ইত্যাদির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের মাধ্যমে ঐ শোষন পরিচালিত হয়েছে। এসব বিষয়ের ওপর নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো। আলোচনার শুরুতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবো জমির ওপর।

—জুম পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী চাষাবাদ পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অন্যান্য স্থানে যে সব নামে পরিচিত তার মধ্যে রয়েছে swidden cultivation, shifting cultivation, slash and burn agriculture ইত্যাদি। মধ্য আমেরিকা, পশ্চিম এমাজন অঞ্চল (কলম্বিয়া, পেরু, ইকুয়েডর, ব্রাজিল), মধ্য আফ্রিকা, পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশেও (ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায়) এই পদ্ধতির চর্চা লক্ষ্য করা যায়। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, বন পরিস্কার করে সেই জায়গায় সাময়িক কালের জন্য চাষাবাদ করা ; চাষ শেষে সেই স্থানগুলো আবার উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য ফেলে রাখা হয় যাতে করে নতুন করে আবার গাছপালা হয়। ইতিমধ্যে, উপর্যুপরী নতুন নতুন বন পরিস্কার করা হয়।[২৬] গোড়াতে জুম চাষের সময় ছিল ১০ থেকে ১৫ বছর। কিন্তু জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন তা ২ থেকে ৩ বছরের ভেতর নেমে এসেছে। এতে চাল, কুমড়া, কার্পাস, লেবু এবং গম চাষ করা হয়। এসব বাদেও অন্যান্য যে সব ফসল উৎপাদিত হয় তার মধ্যে রয়েছে মিষ্টি আলু, হলুদ, আদা, সীম, টমেটো, মরিচ এবং তেলবীজ।

—জমির ওপর পাহাড়ী মানুষদের রয়েছে প্রাচীন অধিকার। পাহাড়ী মানুষদের মতে, পাহাড়ের সমস্ত জমির মালিক দলগতভাবে তারা ; আর প্রত্যেক চাষীর জমির কিছু অংশে চাষ করার অধিকার আছে।[২৭] এই ধারনায় জমির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত নয়। অন্যদিকে পাহাড়ী জনগণের অনুমতি না থাকায় তারা দখলদার বাঙ্গালী বসতিদের অবৈধ বিবেচনা করে ; বিবেচনা করে জবর দখলকারী হিসেবে। পক্ষান্তরে বাঙ্গালী বসতস্থাপনকারীরা 'অব্যবহৃত' জমিকে 'চাষযোগ্য' করে, চাষাবাদের ব্যবস্থা করে, এবং এসব জমিকে 'নিজেদের' জমি বলেই মনে করে। কিন্তু কার্যত এই সব জমি অকর্ষিত থাকে

াকা	ভাষা	উৎপত্তি স্থল	কত বছর ধরে বসবাস করছে	ধর্ম
	আরাকানী (বর্মী স্থানিক ভাষা)	আরাকান	১৫০ বছর	বৌদ্ধ, এ্যানিমিস্ট
	চাটগাঁইয়া বাংলা	আরাকান	অন্তত ১০০ বছর	বৌদ্ধ
	চাটগাঁইয়া বাংলা[১]	আরাকান (?)	—	—
	চাক (বর্মী বিভাগ)	আরাকান বা চীন পাহাড়	—	—
	ত্রিপুরা (টিবেটো বর্মী গ্রুপ)	ত্রিপুরা পাহাড়	কয়েক শতাব্দী (মারমাদের পূর্বে)	হিন্দু
	মুরং (টিবেটো বর্মী গ্রুপ)	ত্রিপুরা পাহাড়(?)	—	—
	ম্রো (টিবেটো বর্মী গ্রুপ)	"জেলার সত্যি-কার আদিবাসী"	কয়েক শতাব্দী	—
	চীন ভাষী গ্রুপ	বার্মার দক্ষিণ চীন পাহাড়	২০০ বছর	বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান
	টিবেটো বর্মী গ্রুপ	চীন পাহাড় (?)	—	খ্রীষ্টান, এ্যানিমিষ্ট
াত্তে,	দক্ষিণ চীন ভাষা	উত্তর আরাকান	কয়েক শতাব্দী (মারমাদের পূর্বে)	—
া	টিবেটো বর্মী গ্রুপ	—	মারমাদের, চাক-মাদের পূর্বে	খ্রীষ্টান

না

গোষ্ঠীর নাম	বিকৃত (derogatory) নাম	আনুমানিক সংখ্যা	বাসস্থান: পার্বত্য চট্টগ্রাম	বাসস্থান: পার্শ্ববর্তী
মারমা	মগ (মানে ডাকাত, জলদস্যু, নৈরাজ্যবাদী)	১,০০,০০০	প্রধানত বোমাং, মং সার্কেল	—
চাকমা	—	১,০০,০০০	প্রধানত চাকমা সার্কেল	—
দৈগনাক বা তঞ্চঙ্গ্যা	—	+	চাকমা ও বোমাং সার্কেলের মাঝে	বা
চাক	—	কয়েক শত	দক্ষিণ পার্বত্য চট্টগ্রাম	আ
ত্রিপুরা	—	২০ থেকে ৩০ হাজার	প্রধানত মং, কিছু বোমাং ও চাকমা সার্কেলে	ভা
মুরং	—	কয়েক হাজার	প্রধানত বোমাং সার্কেলে	—
ম্রো	ল্যাংটা, কুকী, লাংয়ে (মানে জংলী)	৪ থেকে ৮ হাজার (?)	প্রধানত বোমাং সার্কেলে	আর
খ্যাং	—	৫০০	বোমাং সার্কেল	বার্ম ভার
বনযোগী ও পাংখো	লাংয়ে, কুকী (মানে জংলী)	৪,০০০	চাকমা ও বোমাং সার্কেল	—
খামী	কুয়ে মী (কুকুর মানুষ)	২,০০০	বোমাং সার্কেল	বাম আর
লুসাই	—	কয়েক হাজার	চাকমা সার্কেল	ভার

+ অনুমান করা সম্ভব না

১ রেখা অনুমিত, নির্দিষ্টভাবে উ

জুম চাষাবাদের (shifting cultivation) জন্য। অথচ সরকার এগুলোকে বিবেচনা করে 'খাস জমি' হিসাবে, এবং তা বসত স্থাপনকারী বাঙ্গালীদের মাঝে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী বিতরণের প্রয়াস পায়। এইভাবে সরকার বসত স্থাপনকারীদের পক্ষাবলম্বন করে। অধিকন্তু ব্যাপকভাবে মনে করা হয় যে, জুম চাষের ফলে বনভূমি উজাড় হওয়ায় তা পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। অন্যদিকে পাহাড়ী অধিবাসীদের মতে প্রকৃতপক্ষে সরকার হাজার হাজার একর বনভূমি কেটে উজাড় করেছে। ইউ এস এইডের অর্থায়নে ১৯৫৯ সালে কাপ্তাই বাঁধের কাজ শুরু হয়ে ১৯৬৩ সালে সমাপ্ত হয়, এই বাঁধের অন্তর্গত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট চাষযোগ্য জমির শতকরা ৪০ ভাগ; ১ লক্ষ অধিবাসী (প্রধানত চাকমা) বাড়ীঘর ও চাষাবাদের জমি হারায়।[২৮] অবশ্য সরকারী পক্ষ থেকে এজন্য অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণ এবং অন্যত্র জমি প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়। কিন্তু এ মর্মে অভিযোগ রয়েছে যে, ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে ৬০ হাজার অধিবাসীই কোন ক্ষতিপূরণ পায়নি; পরবর্তীতে এদের মধ্য থেকে ১০ হাজার পাহাড়ী ভারতে অভিগমন করে।[২৯] কেননা এদের কোন স্বীকৃত জমি ছিল না; এমনকি পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী এলাকা প্লাবিত হওয়ায় যে ৮ হাজার পরিবার স্থানচ্যুত হয় তাদের পুনর্বাসন কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি। জুম চাষের জমির মারাত্মক অভাব সত্ত্বেও এদেরকে জুম চাষে বাধ্য করা হয়েছিলো।[৩০] এদের পুনর্বাসনের জন্যে কাসালংয়ের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের একটি অংশ বরাদ্দ করা হয়েছিলো। তবে সর্বাগ্রে বসত স্থাপনকারী বাঙ্গালীদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা ছিলো তাতে। পুনর্বাসনের জন্য ৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থবরাদ্দ করা সত্ত্বেও এতদসংক্রান্ত কাজে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে মাত্র ২.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৩১] পাকিস্তান সরকার বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে করমুক্ত এলাকা ঘোষণা করেছিলো। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে গড়ে উঠেছিলো রেয়ন, দিয়াশলাই ও সিগারেট কারখানা ও কর্ণফুলী কাগজকল। কিন্তু এই শিল্পায়ন উপজাতীয় নাগরিকদের কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি। কর্ণফুলী কাগজ কলের ৬০০০ জনের বিরাট শ্রমশক্তির ভেতর মাত্র ৪০ জন হচ্ছে "উপজাতীয়।"[৩২]

—সারা দেশের বিদ্যুৎ সরবরাহের মাত্র শতকরা ০.৫ ভাগ এবং শিল্প ও বাণিজ্যের বিদ্যুৎ চাহিদার শতকরা মাত্র ৩ ভাগ সরবরাহ হয় কাপ্তাই থেকে। কাপ্তাই বাঁধ থেকে শুধুমাত্র কাপ্তাই রাঙ্গামাটি এবং চন্দ্রঘোনা এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়। অথচ এ সকল অঞ্চলে শতকরা ১০ ভাগেরও কম "উপজাতীয়" অধিবাসী বাস।[৩৩]

—১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডের শতকরা ৬০ ভাগ জনশক্তি পাহাড়ী নাগরিক হলেও এর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের হাতে। সম্ভবতঃ এ কারণেই চাকমা, মং প্রধানগণ বোর্ডের সভায় অংশ গ্রহণ করেন না।[৩৪]

—১৯০৮ সাল হতে বিভিন্ন সময়ে তেল অনুসন্ধান কাজ পরিচালিত হয়েছে। পেট্রো বাংলা ১৯৭৬ সালে তেল অনুসন্ধানের লক্ষ্যে চুক্তি করার জন্যে বিদেশী কোম্পানীগুলোকে আমন্ত্রণ জানায়। ১৯৮১ সালে এ ব্যাপারে শেল পেট্রোলিয়ামের সাথে একটি চুক্তি সাক্ষরিত হয়। চুক্তি সাক্ষরের সময় বাংলাদেশ সরকার বোনাস বাবদ ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ লাভ করে। তেল অনুসন্ধানের এলাকা হিসেবে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম জেলার অংশ বিশেষ নির্ধারণ করা হয়। এ মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ৮ বছরের মধ্যে তেল পাওয়া না গেলে ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তি আপনা আপনিই বাতিল হয়ে যাবে।[৩৫] চুক্তি অনুযায়ী ১৯৮৩ সালে অনুসন্ধান শুরুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শেল কোম্পানী ভবিষ্যৎ সংঘাত অব্যাহত থাকার আশংকায় এ প্রত্যাশা করে যে, বাংলাদেশ সরকারকে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পার্বত্য জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক আন্দোলন দমানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সহ বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। আমি শুধুমাত্র দু'টো পদক্ষেপ যথা বাঙ্গালীকরণ (Bengalisation) পরিকল্পনা অথবা বসত স্থাপন (settlement) পরিকল্পনা এবং ইসলামীকরণ নীতিমালার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করব। ১৯৭৯ সালের মাঝামাঝিতে জিয়াউর রহমান সরকার পরবর্তী বছর ৩০ হাজার বাঙ্গালী পরিবারের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসত স্থাপনের (settle) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৩৬] এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে জেলা এবং

মহকুমা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসে ইচ্ছুক বাঙ্গালীদের খুঁজে বের করার জন্যে এজেন্ট নিযুক্ত করে। ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন শুরু হয়। বসত স্থাপনকারী প্রতিটি বাঙ্গালী পরিবারকে নগদ ৩ হাজার ৬ শত টাকা ও ৫ একর জমি দেওয়া হয়।[৩৭]

এই কর্মসূচীর কারণে ১৯৮১ সাল নাগাদ পাহাড়ী অঞ্চলে বাঙ্গালী-দের সংখ্যা এতদ অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশে উন্নীত হয়। গার্ডিয়ান পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী ১৯৮৪ সাল নাগাদ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসত স্থাপনকারী বাঙ্গালীদের সংখ্যা প্রায় ৩ থেকে ৪ লক্ষে দাঁড়ায়।[৩৮] এদের মধ্যে অধিকাংশ বাঙ্গালী কৃষক এসেছে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, সিলেট এবং কুমিল্লা জেলা থেকে। বস্তুতঃ এই বসত স্থাপন পরিকল্পনা বাঙ্গালী দরিদ্র কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নের কোন পদক্ষেপ নয় বরং অনিবার্য ভাবেই এটি হচ্ছে "একটি রাজনৈতিক তৎপরতা, যার লক্ষ্য হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালীদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করে বাঙ্গালীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উপজাতীয় নাগরিকদের আত্মনিয়ন্ত্রাধি-কার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক করা। (" ...a political act to nullify the question of tribal rights to self determination by increasing the number of Bengalis in the Hill Tracts to a majority")।[৩৯] দীর্ঘ মেয়াদে এই পুনঃ বসতস্থাপন (resettlement) সমতল ভূমির দরিদ্র কৃষকদের বদলে বরং ধনীদেরই লাভবান করবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস ইচ্ছুক প্রতিটি বাঙ্গালী পরি-বারকেই ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, যারা সাধারণত ধনী কৃষক, তাদের কাছ থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হয়। এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, ইউনিয়ণ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট প্রদানের বিনিময়ে প্রান্তিক চাষীদের বসত বাড়ী অথবা যে সামান্য জমি তাদের মালিকানায় রয়েছে তা করায়ত্ব করেছে।[৪০]

পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেমোগ্রাফিক চিত্র অপর পৃষ্ঠায় দেয়া হলো।[৪১] কিছু কিছু সংখ্যা (figure) খুবই কম এবং অন্যান্যগুলো খুবই বিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের ভাষ্যানু-যায়ী "বিগত দশকে পর্যায় ক্রমিক সরকার সমূহ প্রায় ৩ লক্ষ বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীকে ঐ ভূখণ্ডে সংস্থাপন করেছে। ফলশ্রুতিতে জন-

সন	পার্বত্য জনগোষ্ঠী	বাঙ্গালী	মোট
১৯৫০	২,৪০,০০০ (৯০%)*	২৮,০০০ (১০%)	২,৬৮,০০০
১৯৬১	—	—	৩,৮৫,০০০
১৯৭০	৫,৭৪,০০০ (৮৮%)	৭৬,০০০ (১২%)	৬,৫০,০০০
১৯৭৪	—	—	৫,০৮,০০০
১৯৮০ ক)	৫,৯০,০০০ (৭০%)	২,৫৫,০০০ (৩১%)	৮,৪৫,০০০(রশিদ)
খ)	৬,৫৩,০০০ (৭৪%)	২,২৫,০০০ (২৬%)	৮,৭৮,০০০(মাহা-খেরো)
গ)	৩,৭৮,০০০ (৬৩%)	২,২৫,০০০ (৩৭%)	৬,০৩,০০০ (মন্টু)
১৯৮১	—	—	৭,৪৬,০০০ (বি,বি,এস)

*শতাংশের হিসাব করেছে রে. আ.

রশিদ ঃ উল্ফগ্যাঙ মে'র "The Tune of the Hills : History and Tradition in the CHT", তার সম্পাদিত গ্রন্থে উল্লেখিত।

মাহাখেরো ঃ উপরোক্ত প্রবন্ধে উল্লেখিত।

কে, মন্টু ঃ 'Tribal Insurgency in Chittagong Hill Tracts'', *Economic and Political Weekly*, 6.9. 1981

গোষ্ঠীর ভারসাম্য খুবই দ্রুত বদলে গেছে। ১৯৪৭ সালে যেখানে ছিল শতকরা ৯০ ভাগ উপজাতীয় সেখানে ১৯৮১-এ তা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৫৪ ভাগে"। ("Over the past decade, successive governments have settled close to 300,000 ethnic Bengalis in that territory, radically altering the ethnic balance in the area from 90 percent tribal in 1947 to 54 percent tribal in 1981.")[৫২]

ইসলামীকরণ নীতির আওতায় ধর্মীয় নিপীড়ন, মন্দিরের পবিত্রত নষ্ট এবং সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা জুড়ে শত্শত মসজিদ নির্মাণের অভিযোগ পাওয়া গেছে।